বুদ্ধদেব বসু থেকে বিনায়ক দত্ত

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে দেশ পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর অনুদ্ধারণীয় গল্পটি প্রথম পড়েছিলাম। বাংলার ইতিহাসে যে সময়টাকে নকশাল আমল বলে তখন সেই সময়। এ গল্পের অন্যতম চরিত্র অমিতের সঙ্গে তখনকার যুগলক্ষণগুলি খুব মিলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এটা অমিতেরই গল্প। অন্য যে আর একটি চরিত্র এ গল্পে আছে - বৃদ্ধ বিনায়ক দত্ত, তার দরকার শুধু অমিতকে কথা বলানোর জন্য।

ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর পার হয়েছে। যুবক অমিতের প্রতি বয়োধর্মে ও কালধর্মে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের যে পক্ষপাতিত্ব ছিল তার পালাবদল হয়েছে। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এর মধ্যে। বই আকারে অনুদ্ধারণীয় প্রেমপত্র গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত হল ১৯৭২ সালে, তার দু বছরের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যু হল। বিনায়ক দত্ত যে অমিতকে বলেছিলেন "অত ব্যস্ত কেন অমিত, এমনিও আমার আর বেশিদিন নেই" সেকথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। অমিতের মত ছেলেরা বিপ্লবের উৎক্ষিপ্ত অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের মত কে কোথায় ছিটকে পড়ল জানা নেই। যৌবনের দুর্মর উপাসক বুদ্ধদেব বসুর শতবার্ষিকী এসে গেলো। তখন আর একবার অনুদ্ধারণীয় পড়ে বুঝতে পেরেছি এটা অমিতের গল্প নয়, বৃদ্ধ বিনায়ক দত্তের গল্প। অমিত তাঁকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখাবার উপায়মাত্র। নিজের অনতিদূর মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে করতে বুদ্ধদেব বসু হয়ত ভেবেছিলেন নিজের একটি শুদ্ধ অন্তঃসার ভাবীকালের জন্য রেখে যাবেন। অনুদ্ধারণীয় সেই প্রয়াসের ফল।

ঘুম থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে বিনায়ক দত্তের গাড়ি খারাপ হয়। আসলে খারাপ হয় নি। ঘটনাটা পূর্বপরিকল্পিত। স্বভাবতই বিনায়ক তা জানতেন না। এই ড্রাইভারের পরামর্শে ও সাহায্যে তিনি নিকটবর্তী এক ডাকবাংলোয় অপেক্ষা করতে এলেন। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথের প্রান্তে বনের মধ্যে পরিকল্পিতভাবে লুকনো এই পরিত্যক্ত ডাকবাংলোয় তাঁর সঙ্গে অমিতের দেখা হলো।

অমিত একজন চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের, ছিপছিপে চেহারার টানটান চামড়ার উজ্জ্বল যুবা। বছর কুড়ি আগে বিনায়কের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। তার পর থেকে দীর্ঘকাল সে তাঁর রচনার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, অভিভূত ছিল। বিনায়কের কবিতা পড়ে তার চোখে জল আসত। তাঁর রচনা থেকেই সে জেনেছিল "ছন্দের আনন্দ, ভাষার মাদকতা, প্রেমের বেদনা, বেদনার গৌরব, আর এক ব্যাপ্ত বিলাসী বিষাদ।"

দুজনের সম্পর্ক শুধু ওইটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এক প্রজন্মের ব্যবধান থেকে দুজনের মধ্যে সেই একাত্মতা তৈরি হয়েছিল যা গু-শিষ্য, পিতা-পুত্র, লেখক, পাঠক সম্পর্কের সারাৎসার। তাদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন ছিল না। রক্তসম্পর্কের যে বন্ধন সেখানে মনের টানের সঙ্গে মিশে থাকে নানা স্বার্থ, অভিমান ও উদ্বেগের খাদ। কিন্তু যেখানে সামাজিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা নেই, আছে শুধু অন্তরাত্মার জন্য একটি অনুকূল মিলনক্ষেত্র, যেখানে কোনো কোনো শুভলগ্নে গু শিষ্য অনুভব করে যে এক আগুন থেকে যেন আর একটি আগুন জ্বলে উঠল। বিনায়কের কাছে এসে অমিত সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিল। ফলে সে শুধু তাঁর রচনায় অভিভূত না থেকে মানুষ হিসাবেও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। সেই ভালোবাসা আজও অম্লান। আজকে এই নির্জন পাহাড়ি বাংলোয় ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাৎকারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি তাদের গভীর টান তাদের প্রতি কাজে, কথায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত হচ্ছে।

বিনায়কের মুখের প্রতিটি রেখা অমিতের চেনা, তাঁর তুচ্ছতিতুচ্ছ অভ্যাসগুলিও সব তার মনে আছে। আজকে এই পরিত্যক্ত বাংলোর ধূলিমলিন ঘরে বিনায়ক দু দণ্ড থাকবেন বলে অমিত তাঁর আরামের জন্য তৈরি রেখেছে আগুনের পাত্র, জোগাড় করে রেখেছে দুর্লভ সব খাদ্যপানীয় যা যা তিনি ভালোবাসেন। তাঁর গায়ের টুইড কোটটি কোথা থেকে কেনা, গলার হলদে মাফলার কবে কোথায় একবার হারিয়ে গিয়েছিল সব তার মনে আছে। জানলার ফাঁকে গে

ালাপি আভাময় যে সন্ধ্যা দেখা যাচ্ছে তা যে বিনায়কের প্রিয় দৃশ্য, এখন যে হেমন্তকাল, আর হেমন্ত তাঁর প্রিয় ঋতু সবই সে জানে। এখনও সে গর্ববরে বলে, আপনার বিষয়ে আমার স্মরণশক্তি বরাবরই অসাধারণ'; এবং এই সবই সে বলে এবং করে এমন সময়ে যার অল্পক্ষণ পরেই সে বিনায়ককে স্বহস্তে হত্যা করবে।

বিনায়ক দত্ত সাহিত্যিক এখন তিনি ষাটোর্দ্ধ অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ। তাঁর চুল শাদা, গলার চামড়া ঢিলে, বয়সের কারণে শরীর থেকে মেদ ঝরে গিয়ে আরও ছোটখাটো লাগে, কিন্তু তাঁর মনে এখনও জরার ছোঁয়া লাগেনি। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর, ইন্দ্রিয় গুলি সজাগ ও সতর্ক। আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংযমের ক্ষমতা অটুট; পরিণত বয়স তাঁকে আত্মবিষয়ে মোহমুক্ত হতে শিখিয়েছে, কিন্তু চিত্তের সরসতা নষ্ট করেনি। এখনও কৌতুকের কথায় তিনি পিছনে একটু মাথা হেলিয়ে দু হাতে ছোট্ট তালি দিয়ে হা হা করে হেসে উঠতে পারেন। এই লোকটি যে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু সে বিষয়ে লেখক কোনো সন্দেহ রাখেন নি। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, মুদ্রাদোষ, পছন্দ - অপছন্দ, এবং জীবনের কোনো ঘটনা উল্লেখ করে পাঠককে বুঝতে দিয়েছেন তিনি কে। এমন কি তাঁর নাম যে বিনায়ক দত্ত সেখানেও মূল নামের সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই বিনায়কের কাছে অমিত কি পেয়েছিল, এবং কেনই বা আজ সে তাঁকে হত্যা করতে চলেছে সেই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর বিনায়ক দত্ত হয়ে ওঠার ইতিহাস রয়ে গেছে। খুঁজে দেখা যাক সেটা কি?

।। এক।।

১৯০৮ সালের ৩০শে নভেম্বর বুদ্ধদেব বসুর জন্ম হয়। শৈশব কাটে নোয়াখালিতে। অল্প বয়সে তিনি স্কুলে যান নি। প্রথম স্কুলে ভরতি হন নবম শ্রেণীতে, ঢাকায়। এতদিন বাড়িতে তাঁর শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন দাদামশাই চিন্তাহরণ সিংহ। "তিনি আমাকে অল্প বয়সে স্কুলে ভরতি করেন নি এজন্য আমি অন্তহীন ভাবে কৃতজ্ঞ' (আমার ছেলেবেলা বুদ্ধদেব বসু)। "তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম বন্ধু ও প্রথম ক্রীড়াসঙ্গী - চাকুরির সময়টুকু বাদ দিয়ে তিনি আমাকেই তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন" (ঐ)। পরবর্তীকালে এভাবেই বুদ্ধদেব বসু তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। দাদামাশায়ের হাতে তাঁর ইংরাজি শিক্ষার ভিতটা খুব পাকা কন্দের গড়া হয়েছিল বলে, এবং সে শিক্ষা স্কুল সিলেবাসের ছাঁচে ঢালা ছিল না বলে, খুব কম বয়স থেকেই বুদ্ধদেব সে ভাষার অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিলেন। সাত আট বছর বয়স থেকেই স্বাধীনভাবে বই পড়তে ও লিখতে তাঁর আটকাতো না। তাঁর বাংলা শিক্ষার গু ছিলেন যে াগীন্দ্রনাথ উপেন্দ্র কিশোর থেকে শু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা শিশুসাহিত্যের দিকপালেরা। কিছু পরিমান সংস্কৃত শিক্ষাও তাঁর হয়েছিলর যার সুফল তিনি শেষ বয়স পর্যন্ত কুড়িয়েছেন। বাংলা ও ইংরাজি দুই ভাষাতেই অজস্র বই পড়ে, এবং গদ্য পদ্য অনর্গল রচনা করে স্কুলে যাবার আগেই পরিচিত মহলে তাঁর কবিখ্যাতি হয়েছিল। এইভাবে নিজ প্রবণতা অনুযায়ী বিকশিত হবার ফলে তাঁর ধীশক্তি কোথাও বাধা পায়ে নি, এবং বিধিদত্ত যে প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তার কোনো অপচয় হয় নি। "কী ছিলাম আমি সেই সময়ে? একটা আবেগের পিণ্ড, বাস্তবে কল্পনায় জট পাকানো একটা বাণ্ডিল - অগোছালো, অস্থির দোলায়মান, - মনের এক অংশে নেহাৎ ছেলেমানুষ, অন্য অংশে বয়স্কের চেয়েও অধিক বয়স্ক। কাঁপছি আমি সারাক্ষণ, যে কোনো হাওয়ায়, যে কোনো ইঙ্গিতে। ... আমার কলম চলে চিন্তাহীন ও মসৃন - শব্দ মিল ছন্দ, সবই আমাকে অতি সহজে ধরা দেয়, যতক্ষ ণ লিখি, মৌজে থাকি (আমার ছেলেবেলা বু.ব.)।

এইভাবেই কেটেছিল তাঁর ছাত্রজীবন - ১৯২৩ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব। ছাত্রাবস্থায় এমন একটি শান্তিপূর্ণ নির্ভার জীবন তিনি পেয়েছিলেন যা তাঁর প্রতিভার স্ফুরনের জন্য যেন ফরমাশ দিয়ে তৈরি করা।

বুদ্ধদেব জন্মমূহূর্তে মাতৃহীন হন। পত্নীর শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁর বাধা ভূদেব বসু কিছুদিনের জন্য সংসারে আসক্তি হারিয়ে চলে যান দূর দেশে। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর দিদিমা দামামশায়ের কাছে যেভাবে মানুষ হয়েছিলেন তাতে মাতৃহীন শিশুর মনোকষ্ট তাঁকে কখনো সইতে হয় নি। তাঁদের নিজেদের পরিবার খুব ছোটো ছিল। কিন্তু সেজন্য তিনি নিঃসঙ্গ শৈশব কাটিয়েছিলেন এমন নয়। সেকালের পল্লীপ্রন বাঙ্গালী গৃহস্থের সকলেরই আত্মীয় কুটুম্ব সমাকুল একটি বৃহৎ পরিমণ্ডল থাকত। তাঁদেরও ছিল, এবং তাদের সঙ্গে অবিরল মেলামেশাও ছিল। ফলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছিল যে তাঁর নিজের বাড়িতে ভিড় নেই। দায় নেই, কোনোরকম জটিলতা নেই, অথচ হাতের কাছেই যেমন খুশি স্বজনবন্ধু বেছে নেবার সুযোগ আছে। তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষার অল্পদিন আগে দাদামশাই মারা যান। দিদিমা ঢাকার নবনির্মীয়মান

পুরানা পল্টনে ছোট একটি টিনের চালের বাড়ি তৈরি করে তাঁকে নিয়ে সেখানে উঠে এলেন। পুষ অভিভাবকহীন উঠতি বয়সের ছেলে নিয়ে তাঁর কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। শাসনের দড়িটা তিনি কোনোদিনই শক্ত করে বাঁধেন নি। বাঁধবার দরকারও হয় নি, কারণ ততদিনে তণ বুদ্ধদেবের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে একটা স্ব-আরোপিত সংযম ও নিয়মনিষ্ঠা। ফলে তিনি বড় বয়ে উঠেছেন একটা পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে। তিনি যখন যা করতে চেয়েছেন কোথাও বাধা পান নি। তাই ছাত্রজীবন থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধেএকটা সুস্থির সঙ্কল্প তাঁর মনের মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

সেই সঙ্কল্পের পরীক্ষা হল এখন কলকাতায় আসার পরে, ১৯৩১ সালে এম এ পাশ করার পর ঢাকার বাস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় পাকাপাকিভাবে চলে এলেন। কলকাতা ছাড়বেন না বলে তাঁর চাকরি পেতে দেরি হলো। কিন্তু তিনি কলকাতাতেই রয়ে গেলেন তাঁর প্রার্থিত সাহিত্যিক পরিমণ্ডল পাবেন বলে। প্রায় কর্পদকশূন্য অবস্থায় তিনি কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু লেখালিখি এবং টিউশানির আয়ে কায়ক্লেশে চালিয়ে নিতে লাগলেন ঠিক। একটা একটা করে বই বেরোতে লাগল; সুনাম দুর্নাম দুইই জুটল। শনিবারের চিঠির কল্যাণে পাওয়া এই দুর্নাম প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভালোই করেছিল, কারণ তাঁর নামটা ফিরতে লাগল অনেকের মুখে; কেনা জানে সাহিত্যসংসারে নবাগত লেখকের পক্ষে সমালোচকদের উদাসীনতাই ক্ষতিকর, নিন্দাবাদ নয়। এই সময়টায় বাইরের নানা টানাপোড়েন এবং নিজের ভিতরকার নিত্য উপচীয়মান কল্পনার বেগে তিনি সতত আন্দোলিত হয়েছেন, এবং তাঁর কলম থেকে বন্যাস্রোতের মত অবিরাম গদ্য পদ্য নিসৃত হয়েছে।

আশ্চর্য এই যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কলমের এই সাবলীলতা কখনো নষ্ট হয় নি।

এইভাবে কলকাতা শহরে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে চলল। ইতিমধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম পরিবর্তন হয়েছে। রাণু সোমের সঙ্গে (প্রতিভা বসু) প্রেম ও বিবাহ, দুই কন্যা ও এক পুত্রের জন্ম, রিপন কলেজে চাকরি এবং এগারো বছর পরে সেই চাকরি থেকে পদত্যাগ, কবিতা পত্রিকা প্রকাশ এক পয়সায় এক গ্রন্থমালা ছাপানো, কবিতাভবন প্রকাশনার সূত্রপাত, দুশো দুই রাসবিহারী এভিনিউ এর ছোটো বাড়িটিতে শিকড় গেড়ে বসা, এই সব ঘটনা ঘটে চলে তিনি নিষ্ঠাভরে পালন করে চলেছেন যুগপৎ লেখক ও সম্পাদকের দায়িত্ব। তাঁর কবিতা পত্রিকা প্রথিতযশা দের উপেক্ষা না করেও হয়ে উঠেছে উদীয়মান কবিদের মুখপাত্র। প্রকাশকুণ্ঠ জীবনানন্দ থেকে অতিতণ সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবিদেরও পাঠকের কাছে পরিচিত করাবার দায় গ্রহন করেছেন সম্পাদক। তাঁদের বিষয়ে অন্তদৃষ্টিপূর্ণ নিবন্ধ লিখছেন সোৎসাহে ও সানন্দে। এই পত্রিকার গায়ে কোনরকম গোষ্ঠীস্বার্থের আঁচ তিনি লাগতে দেন না। কবিতায় যাঁরা লিখছেন তাঁরা সবাই যে এজন্য সম্পাদককে পছন্দ করেন তা নয়, তাঁরা সবাই যে পরস্পরকে পছন্দ করেন তাও নয়, এমন কি তাঁদের সকলের মত ও পথের প্রতি যে সম্পাদকের সমর্থন আছে এমনও নয়; "কিন্তু কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে, যখন তিনি এত ভালো কবিতা লিখছেন" এই হল সম্পাদকের মনোভাব।

এইরকম করে তিনি যৌবনের অপর প্রান্তে পৌঁছলেন; লেখক হিসাবে তাঁর পরিচয় হল। নিজের জীবনে ভালো মন্দ নানা অভিজ্ঞতা হল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। যদি কল্পনা করি তাঁর নাম বুদ্ধদেব বসু নয়, বিনায়ক দত্ত, তাহলে এই সময়েই অমিতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূচনা।

।। দুই ।।

চিরকাল ধরে লেখককুল যেরকম পাঠকের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন বিনায়ক দত্তের কাছে অমিত ছিল ঠিক তাই। তখন তার তণ বয়স। মনের বৃত্তিগুলি জীবনরস আহরণের জন্য চারিদিকে ডালাপালা মেলে দিচ্ছে। সে যেমন করে বিনায়কের রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা আপনার মধ্যে শোষণ করে নিয়েছিল, কোনো পরিণতবুদ্ধি, পরিণত ব্যক্তিত্ব, বয়স্ক মানুষ তা পারত না। অমিত হবে উঠল বিনায়কের যথার্থ উত্তরাধিকারী। মেধা ও পরিশ্রমের গুণে ব্যবহারিক জীবনেও সে উন্নতি করল। বড় চাকরি, মোটা মাইনে, বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি, এবং স্ত্রী, কন্যা ও বিপত্নীক বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে সে সংসার পেতেছিল।

তারপর তার জীবন হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত বাঁক নিল। নিজের ঐহিক সাফল্যে লজ্জা হল তার। সাহিত্য থেকে যে চিৎপ্রকর্ষ সে পেয়েছিল তাকে মনে হল সর্বৈব মিথ্যা। সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখল জগতে শুধু ক্ষুধা, বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অবিচার, মৃত্যু। তার মনে হল এই দু খের মাঝখানে আরামে বসে থেকে কল্পলোকের গান গাওয়া

অপরাধ। বিনায়ককে ডাকবাংলায় ডেকে এনে সে বলেছিলো "মানুষের কান্না আমার কানে পৌঁছেছে, কোনো কবিতা আর আমাকে কাঁদাতে পারবে না। আপনি কি জানেন সে কান্না কী? বৃথা এ ক্রন্দন, বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা - ত া নয়, তানয়। ক্ষুধিতের চিৎকার, উৎপীড়িতের আর্তনাদ, বঞ্চিতের বিক্ষোভ, বিদ্রোহের গর্জন - আপনি কি তা শুনেছেন কখনো, বিনায়ক দত্ত?" অপরাধবোধে জর্জর হয়ে অমিত চাকরি, ঘরবাড়ি পরিবার সব ছাড়ল, স্বনির্বাচিত এক কর্মপন্থা নিয়ে সে দিকে দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, এবং তারই তাগিদে আজ হেমন্তের এক অপরাহ্নে বিনায়ককে এখানে ধরে এনেছে নিজের হাতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবে বলে।

অমিতের এই আকস্মিক পরিবর্তনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত; কিন্তু ওঠেনা এইজন্য যে তখন এরকম ঘটনা দেশে অনেক ঘটছিল। অমিতের এবং তার চেয়ে কম বয়সের অনেক যুবকই তখন নিজেদের উৎসর্গ করেছিল ধংসযজ্ঞে। অমিত তাদেরই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মপন্থার একজন কিনা আমরা জানিনা, কারন তার মুখে একবারও ঐ পথের কোনো দার্শনিক বা নেতার নাম উচচারিত হয় নি। বিনায়কের উপর তার অভিযোগ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। "দশ বছর - আমার যৌবনের প্রথম দশ বছর - আমার সবচেয়ে সক্ষম, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বছরগুলি আমি নষ্ট করেছি স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে, আপনারই পরামর্শে।"

বিনায়ক আজ অমিতের কাছে একই সঙ্গে বধ্য এবং আরাধ্য। সে অকপটে স্বীকার করেছে তা তারা গু শিষ্য একই উপ াদানে তৈরি। নিজ বিশ্বাসের জন্য অমিত ঘর সংসার ভবিষ্যৎ সব ছেড়েছে, আর বিনায়ক তাঁর চিত্তের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য অপবাদ, অবিচার, মিথ্যাভাষণ, জীবিকাহানি, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন শত্রুতা সব সহ্য করেছেন। "অঅপনার হিতৈষীরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে আপনার সংশোধন ঘটাতে, কিন্তু আপনি থেকে গেছেন অনুতাপরহিত, অনুদ্ধ ারণীয়।

তবুও সে বিনায়ককে মারবে এবং আজই। দুটি কারণ সে দিয়েছে। প্রথম কারন সে চায় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের ধবংস (ধবংসের পথে মুক্তি" এই আমার শ্লোগান)। আর সৃষ্টির আদিকাল থেকে কবিতা যতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার ক্ষমতা দেখিয়েছে, এমন তো আর কিছুই নেই। কবিতামাত্রেরই ধবংস সম্ভব নয় বলে আপাতত তার প্রতীক হিসাবে সে বেছে নিয়েছে বিনায়ক দত্তকে। যদিও বিনায়ক নরম হেসে বলেছিলেন 'আমার কবিতা অত ভালো নয়, আমি প্রতীক হতে পারি না'; অমিত তার উত্তর দিয়েছিলো "আপনি হলেন যাকে বলে টিপিক্যাল, আদিপাপের সব লক্ষণ আছে অ াপনার মধ্যে।"

দ্বিতীয় কারণটি অন্যরকম; অমিত দেখেছে লেখক হিসেবে যে স্বীকৃতি বিনায়কের প্রাপ্য ছিল তার থেকে তিনি অন্যায়ভ াবে বঞ্চিত হয়েছেন। বিনা প্রমানে অভিযোগ করা হয়েছে কক্ষনো গুপ্তচরবৃত্তির, কখনো কুম্ভীলকবৃত্তির কখনো বা অশ্লীলতার। তাঁর রচনার অপব্যাখ্যা হয়েছে; নির্বিকার ঔদাসীন্যে পিঠ ফিরিয়ে থেকেছে ক্ষমতাসীন বুদ্ধিজীবীরা, জীবিক ার্জনের ন্যূনতম নিশ্চিন্ততা পাননি কখনো - 'সেইজন্যেই; সেইজন্যেই, তাই তো আপনাকেই আজ প্রয়োজন আমার, অন্য সব কিছুর ওপর আপনাকেই। আপনি কি কখনো ক্লান্ত হন নি আপনাকে ঘিরে জমে ওঠা এই সব অবান্তরতায়, আবর্জনায়, অন্তহীন বিতর্কে? আপনাকে কি পীড়িত করে না পাঠকদের অমনোযোগ, আপনার শূন্যসার সমকালীন খ্যা তি? আপনার নিজের কথা জানি না, অন্য কারো কথা জানি না। কিন্তু আমি এখন আপনাকে দেখতে চাই বিশুদ্ধ ও নির্দ্বন্দ্ব। আমি চাই আপনাকে সেই ভাবীকালে উত্তীর্ণ করে দিতে, যখন আপনার সৃষ্টি হয়ে থাকবে না আপনারই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের দ্বারা সংশয়াচ্ছন্ন ও ধূমল; যখন ধীরে ধীরে আপনি উদ্‌ঘাটিত হবেন আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু প াঠকের কাছে; আবিষ্কৃত হবে আপনার সব বক্রোক্তি, কূটোল্লেখ, প্রচ্ছন্ন আত্মজীবনী, প্রচ্ছন্ন আত্মসমালোচনা, যে রশ্মিজ াল আপনি এক একটি বিশেষণথেকে বিকীর্ণ করেছিলেন, একই পংক্তির মধ্যে পুরে দিয়েছিলেন যে সব উক্তি ও তার প্রতিবাদ।"

আমিত জানে না সে সত্যি কি চায়, বিনায়ক দত্তের বিসর্জন, না তাঁর প্রতিষ্ঠা।

।। তিন।।

১৯৩১ সালে বুদ্ধদেব বসু যখন কলকাতায় এলেন, বংলা সাহিত্যের আকাশে তখন সবেমাত্র অনেকগুলি নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছে। কথাসাহিত্যের তিন দিকপাল বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রোত্তর গীতিকাবতার প্রধানরা যোঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুও একজন) জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি উদীয়মান। কল্লাল গোষ্ঠীর লেখকরা তো ছিলেনই। পুরনো ঘরানার মোহিতলাল মজুমদার, নজল ইসলাম তখনো সত্রিয়। জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছেন শরৎচন্দ্র, আর আধুনিকদের মধ্যে আধুনিকতম রবীন্দ্রনাথ তখনও নিত্য নতুন পরীক্ষায় রত। এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসভায় নিজগুনে জায়গা করে নেওয়া কোনো নতুন লেখকের পক্ষে সহজ ক াজ ছিল না। তার ওপর বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল একেবারেই খালি। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের মত মাটি ঘেঁষা মানুষ তিনি নন। সাহিত্যে তাঁর দীক্ষা হয়েছে বই পড়ে। অল্প বয়স থেকে দেশি ও বিদেশি নানারকম বই পড়ে পড়ে তাঁর মন বুদ্ধি চি পরিশীলিত হয়েছে, অনুভূতিগুলি হয়েছে প্রখর ও শানিত, সংবেদন তীব্র। কিন্তু শুধু এইটুকু মূলধন নিয়ে সমসাময়িকদের সঙ্গে জবরদস্ত প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে আরও কিছু দরকার। আপন শক্তির এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। কোনোদিন নিজের অপরিচিত রাজ্যে পা দেননি; তাঁর কল্লোলীয় সতীর্থদের মতো কখনে বলতে যাননি 'আমি কবি যত কামারের, আর ছুতোরের, মুটে মজুরের'। তিনি জানতেন তিনি প্রধানত রোমান্টিক কবি। এবং তাঁর বিষয়বস্তুর জগৎটা অন্তর্মুখী। সব গীতিকবির মত তিনিও কবিতায় নিজের হৃদয়কেই ব্যক্ত করেছেন; আর গল্প উপন্যাসে নরনারীর প্রেমের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন হাজার বৈচিত্র্য। সেই নরনারীরা অধিকাংশই শিক্ষিত, অনুভূতিশীল, তাঁর সমস্তরের ও সমসমাজের লোক। নিজের কাছে তিনি খাঁটি থেকেছেন, এবং, সুগৃহিনীর মত ব্যবহার করেছেন নিজের অভিজ্ঞতার সম্বলটুকু। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ন াগরিক সমাজের নানা দিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে, নিজ জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন ভুয়োদর্শন, বিদেশে গেছেন, দেশকালনির্বিশেষ মানবস্বভাবের কিছু শাশ্বত লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর শেষজীবনের রচনায় ভিন্নতর গভীরতা এসেছে। আজ শতবর্ষে আমরা তাঁর যে আয়তন দেখি, এবং ভাবীকাল হয়তো যা আরো বড় করে দেখবে, তা অর্জিত হয়েছিল জীবনব্যাপী সাধনায়। অমিতের দুর্ভাগ্য যে সে এই শেষ জীবনের রচনাগুলি পড়ে নি।
পখির চোখ দিয়ে তাঁর রচনাবলী দেখে নেওয়া যাক।
বুদ্ধদেব বসুর রচনা বহুশাখায়িত। এ কথা বললে ভুল হবে না যে রবীন্দ্রনাথের পরে তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভা বংলা সা হিত্যে আর আসেনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, অনুবাদ, শিশুসাহিত্য যেদিকে হাত দিয়েছেন সেদিকেই সফল হয়েছেন। তার সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা এখানে করব না। সংক্ষেপে তাঁর মানসপ্রকৃতির আভাসটুকু দেব। সে কাজে সাহায্য নেওয়া যাক তাঁরই একটি বড় কবিতা থেকে। কবিতাটির নাম সে ও অন্যেরা (স্ব াগতবিদায়) -
এক বালক স্বপ্নে নানা অস্পষ্ট মুর্তি দেখে, যাদুকরের মুর্তি। তারা ডুগডুগি, করতাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর লম্বা ঝুলি থেকে আশর্চ্য সব জিনিস বার করে নেচে কেঁদে হেসে গেয়ে ছোট ছেলেটিকে ফুশলে নিতে চায় -
"শোন, সব তোর জন্য, তোরই জন্য, আয় চলে আয়-
যে ঈষৎ ভয় পায়, একলা ছোটো অন্ধকারে শুয়ে
হাত বাড়িয়ে মাকে খোঁজে, আঁকড়ে ধরে মুঠোতে চাদর
না, আমি যাবো না, বলতে চায়।
কিন্তু তার মুগ্ধতা অনেক বড়ো।
কান পেতে চোখ দেয় ডুবিয়ে স্বপ্নের তলে
আর তার ভবিষ্যৎ যার নাম এখনো জানে না
অন্ধকারে জ্বলে নেভে ছোট্ট এক জোনাকির মতো।"
এই স্তবকটির পাশে রাখা যাক তাঁর আমার ছেলেবেলা। কবিকথিত চিত্রকল্পগুলিকে আমরা যেখানে বাস্তব ঘটনায় অনুবাদ করে নিতে পারব। নোয়াখালির ডেলনি হাউসে কাটানো শৈশবকাল, মেঘনা নদীর ভাঙন, মোহনার পথে ছুটে আসা সামুদ্রিক জোয়ার, পদ্মার খাঁড়িপথ ধরে ধরে নৌকো করে আত্মীয়ের বিয়েতে যাওয়া, নোয়াখালি থেকে চট্টগ্র ামে রেলপথে ভ্রমণ - এইসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্মৃতি যেমন জমা হচ্ছে, তেমনই জমা হচ্ছে সংস্কৃত কবিতার মন্দ্রধ্বনি, ব াংলা ও ইংরাজি কবিতার ছন্দদোলা, গল্পের বইয়ের অজানা দেশ - প্রথমে সন্দেশ ও মৌচাকে পরে ইংরাজিতেও। "আ

মি পড়ছি জুল ভের্ন, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন, ভিক্তর হুগোর উপন্যাস - আমার মন ঘুরে বেড়ায় দূর দেশে, নীলতর অন্য সব আকাশের তলায় - পর্বতে, অরন্য, সমুদ্রে - ভাসে গন্দোলায় চাঁদের আলোয় সন্ধেবেলা, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামে কোনো নতুন শহরে, ক্যাথিড্রেল পাড়ায় সন্ধেবেলা। কিন্তু স্বপ্ন, শুধু স্বপ্ন এগুলো - যেখানে থাকি সেখানে বাঁশবনে সন্ধ্যা নামে ঝামরে, সবুজ পুকরে কচুরিপানা আরও এগিয়ে আসে।" (আমার ছেলেবেলা)

এই তাঁর চেতনার উন্মেষকাল। এর পরেই বালকটি ছন্দ মিলিয়ে লিখতে শিখে যায়; লিখে তার খুব ভালো লাগে; না লিখে থাকতে পারে না; প্রিয় কবিদের থেকে দুহাত ভরে ভাব ও ভাষা সঞ্চয় করে।

"এখন সে জানে, তাই সর্বান্ত করনে
শৈশবের স্বপ্নে দেখা সেই সব মুখের রেখায়
আঁকে দেবলক্ষণ - অবশ্যমান্য - আক্ষরিক।
যেন কোনো জীবন্ত মন্দিরে
সারি সারি বিগ্রহ - নির্বাক নন - সমাচারে সোচ্চার - রহস্যময়
জাগর মন্ত্রে সদ্য ফোটা তার হৃদয়েরে
নিত্য দান দিয়ে যান তাঁরা।"

বুদ্ধদেব বসু তখন বাল্য থেকে কৈশোরে, এক কৌশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। পূর্বজ কবিরা এখন তাঁর গু। এটা তাঁর শিক্ষানবিশির কাল। বাংলা সাহিত্যে হেম নবীনের পর্ব শেষ করে রবীন্দ্রনাথকে চিনেছেন। ইংরাজি রোমান্টিক কবিরা তাঁকে অভিভূত করে রেখেছে। তাছাড়া প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা আমেরিকা থেকে অবিরত পাঠন পশ্চিমি সাহিত্য পত্রিকা, ইউরোপে সাহিত্যিক হাওয়াবদলের সংবাদবাহী খবর কাগজের কাটিং, নতুন নতুন বইপত্র, যেখান থেকে শুধু ইংরাজি নয়, পুরো কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের স্বাদগন্ধ তিনি শোষণ করে নেন। সাহিত্যের একটি সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে। যা পান তাই পড়েন এবং বেশির ভাগই ভালো লাগে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ বন্দীর বন্দনা প্রকাশিত হল ১৯৩০ সালে; এই কাব্যগ্রন্থকে তিনি তাঁর শৈশবের সমাপ্তি এবং পায়ের তলায় প্রথম মাটি বলে মনে করেছিলেন সেদিন বইটি পাঠকমহলে কিঞ্চিৎ আলোড়নও তুলেছিল। তবে আজকে ভিন্ন প্রেক্ষিত দেখলে বইটিকে আর তত ঝকঝকে লাগে না, সুন্দর নিশ্চয়ই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতিরিত্ত নয়। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছেন বিদেশী কবিরাও - "আমার এই তখনকার প্রিয় কবিদের কাছে আমি যে কিছু শিখেওছিলাম আমার কঙ্কাবতী বইটাতে তার নিদর্শন আছে" (আমার যৌবন) যেমন-

"শুধু ওই দূরে দিগন্তরেখা যেখানে চলেছে গাছের নীচে
একসার মেঘ, স, এলোমেলো, আঁকাবাঁকা কালো সাপের মতো
গাছের সবুজ জড়ায়ে শরীর রয়েছে পড়ে।
আঁকাবাঁকা মেঘ। একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা,...
ফাঁকা আকাশের বন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝরে পড়ে সুর - কঙ্কা, কঙ্কা,
কঙ্কাবতী, (কঙ্কাবতী)

এই যে ছোটবড় চরণের এলোমেলো স্তবকে এক বা একাধিক বাক্যাংশ লতার মত পেঁচিয়ে পেচিঁয়ে উঠছে, বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়ে গাছের ফাঁকে তারার মত ঝিকমিক করছে, এটি বুদ্ধদেব বসুর খুব প্রিয় কৌশল। বারবার এ জিনিস তিনি ব্যবহার করেছেন।

এইরকমেরই আর একটি প্রভাবের কথা উল্লেখ করি যা সারাজীবন তাঁর সত্তার অংশ ছিল, -তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বইয়ের নামগুলি দেখলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথে তিনি কতদূর আপ্লুত। রজনী হলো উতলা, রডোড্রেনগুচ্ছ, যেদিন ফুটলো কমল, ধূসর গোধূলি, একদা তুমি প্রিয়ে, ঘরেতে ভ্রমর এলো, তিথিডোর, শোনপাংশু, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, সব পেয়েছির দেশে, আমি চঞ্চল হে প্রভৃতি।

পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ সাহিত্যসংসারে কোনো নতুন জিনিস নয়। কালিদাস, শেক্স্পীয়র থেকে

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই তা করেছেন। দেখা দরকার বাইরের উপাদান কবির রক্তে মিশেছে কিনা। তিনি ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পেরেছেন কিনা। প্রত্যেক শিল্পীর সেটা একটা নিজস্ব যুদ্ধের জায়গা, কারণ যাঁর মধ্যে মৌলিকতা নেই সে শিল্পীর বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।

"কিন্তু আজ তারাই প্রধান শত্রু - সেই দয়াবান দেবতারা -
সে নামে উজ্জ্বল যুদ্ধে। প্রত্যাখ্যানে, কূট আক্রমনে ...
দূর করে পুরনো আসবাবপত্র,
চালায় নির্মম কাঁচি বাগানের ঘনিষ্ঠপল্লবে
ছুটি দেয় ভৃত্যদের যারা তাকে দেখেছিলো ছোটো।
মনে হয় সুবিস্তীর্ন বাস্তুভিটা থেকে
পালিয়ে, তবে সে খুঁজে পাবে তার সম্পন্ন নিজেকে

বুদ্ধদেব বসুর একটা সুবিধা ছিল এই যে তাঁর মধ্যে কোনো স্ববিরোধ ছিল না। নিজের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো তিনি প্রথম থেকেই ভালোভাবে চিনতেন। তাঁর দুর্বলতা এই যে তাঁর পছন্দের জগৎ - বাস্তবে এবং কাব্যে দু জায়গাতেই একটা গণ্ডীর বাইরে যেতে পারত না। গ্রামীন জনজীবন কিংবা শহরবাসী শ্রমিক কিংবা অন্ত্যজ শ্রেনী এঁদের সম্বন্ধে তাঁর না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল আগ্রহ। আর সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল আধুনিক সাহিত্য (দেশি ও বিদেশী), অথবা প্রাচীন মহাকাব্য। আমরা দেখে অবাক হই যে তাঁর বিশাল প্রবন্ধভাণ্ডারে বঙ্কিমের উল্লেখ কত কম। এবং মধুসূদন বিষয়ে তিনি কত অনাগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে মধুসূদন বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ বিরূপ সমালোচনাটি লিখেছিলেন তা বরং বুদ্ধদেব বসুর সমর্থন পায়। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বিষয়ে তাঁর আলোচনা নেই। যদি বা প্রতিতুলনায় কোন কথা বলতে হয় সেখানে ঐ সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অপছন্দ লুকোনো থাকে না। বিদেশি সাহিত্য বিষয়েও ব্যাপারটা একই। ত্র্যাব বা ড্রাইডেনের উল্লেখ করেন তিনি শুধু পরিহাসছলে। মিলটান তাঁর দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন বলে মনে পড়ে না; কিন্তু ইলিয়াড, ওডেসি, রামায়ন, মহাভারত তাঁর পূজা পায়। আসলে সাহিত্যে তিনি খোঁজেন মানুষের জটিল ও গভীর অর্ন্তজগৎকে, বাস্তব জীবনেও সেটা খোঁজেন, আর ভাষায় খোজেন সমুন্নতি, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা। এই যার মনের গঠন, বেশ বোঝা যায়, নিজস্ব জমি খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে কতখানি শক্ত। তাই নিজের অধিকার ও অনুরাগের জগৎটি তাঁকে কর্ষন করতে হয়েছিল খুব নিবিড়ভাবে; ব্যাপ্তির অভাব মেটাতে হয়েছিল তীব্রতা ও গভীরতা দিয়ে -

"যায় দেশান্তরে, শেখে অন্যভাষা, ভিন্ন লোকাচার,
বৈদেশিক ফুলেদের নাম শেখে অতি যত্নে,
কখনো বিপুল ধৈর্যে ভজে শুধু গভীর গণিত,
কখনো বা সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে করে সম্প্রচার
রাজদ্রোহ, গুপ্ত নেশা, অবৈধ সঙ্গীত।"

এ হল যে কোনো বড় লেখকের সমস্ত আয়ুষ্কাল ব্যাপী সংগ্রামের ইতিহাস।

রবীন্দ্রোত্তর প্রধান যে পাঁচ আধুনিক কবি এঁদের প্রত্যেকের এক একটা অতি বিশিষ্ট স্টাইল ছিল। জীবনানন্দের ঝোঁক ছিল সুররিয়ালিস্ট চিত্রকল্পে, বিষ্ণু দে ব্যবহার করতেন দুরূহ শব্দ ও অজানা প্রসঙ্গ, তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদে গূঢ়ার্থবাহী বাক্যবন্ধ রচনা করতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, টুকরো টুকরো ছবি ও ধ্বনি সাজিয়ে অমিয় চক্রবর্তী এক একটা আবহ তৈরি করতেন, এঁদের সকলের কবিতাই অল্পবিস্তর জটিল। তুলনায় বুদ্ধদেব বসুর কবিতাই ছিল সবচেয়ে সরল। ওপরের স্তরে সরল, আত্মায়নর। তাঁর অল্পবয়সে লেখা এইরকম একটি কবিতা দেখে নেওয়া যাক -

আকাশে জমেছে মেঘ; পথ নিরিবিলি,
সব চুপ; রাত দু পহর।
বাড়িগুলি অন্ধকার পথের দুধারে,
ঘুমায় শহর,

শুধু এই জানালায় আলো জ্বলিতেছে,
অন্ধকার শহর নিরালা;
কাছে এসে চোখ তুলে যেই তাকালাম
-বুজিলো জানালা।
এসেছি নিজের ঘরে, বৃষ্টিও এসেছে;
হাওয়ার চিৎকার যায় শোনা;
যার হাত, কাল তার মুখ দেখি যদি,
আমি চিনিবো না।
বিছানায় শুয়ে আছি, ঘুম হারাছেছে;
না জানি এখন কত রাত;
কখনো সে হাত যদি ছুঁই, জানিব না
এই সেই হাত।
(একখানা হাত কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমের কবিতার সংখ্যা কমেছে, বেড়েছে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মকথা কেন্দ্রিক রচনা। কাব্যগ্রন্থের নামগুলি - শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর, মরচে পড়া পেরেকের গান, স্বাগতবিদায় প্রভৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যৌবনাবসানের। কবির মনে এজন্য একটা অন্ত শীল বিষাদ আছে বটে, তবে বয়সের সঙ্গে তাঁর অন্য রকমের একটা সন্ধিও হয়ে গেছে। কবিতাই এখন তাঁর কন্‌ফেশন বা ডায়েরি; অনেক কবিতাতেই তিনি এখন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ইতিহাস সূত্রাকারে লিখে রেখেছেন।

এই সময় তাঁর কাব্যসাধনায় আর একটা শাখা উদগত হয়েছিল - তা হল অনুবাদ। যে সব কবিদের তিনি অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বোদলেয়ার, হোল্ডার্লিন, রাইনের মারিয়া রিলকে, ধরিস পাস্টেরনাক, এজরা পাউন্ড, ই. ই. কামিংস, কালিদাস, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি।

বুদ্ধদেব বসুর গল্প উপন্যাসের পরিমান অনেক। এই সব গল্প ও শিশুসাহিত্যের কিছুটা তাঁর জীবিকার্জনের তাগিদে ফরমাশি লেখা। তবে তার জন্য এগুলির উপভোগতা কমে নি। তাঁর গল্প সুখপাঠ্য। কবিতার মত এখানেও এক ধরনের আপাতসরলতা আছে, আবার সেই সরলতার নীচে মানুষের জটিল মনোজগতটিও আছে। তাঁর গল্প উপন্যাসের সমাজ বেশির ভাগ সময়েই তাঁর নিজের সমাজ, অনেক নায়কই লেখক বা অধ্যাপক, এবং বেশির ভাগ গল্পের বিষয়বস্তু হল প্রেম। এই প্রেম সম্পূর্ণহ রোমান্টিক, আদৌ দেহগত জৈব প্রেম নয়। যদিও অল্প বয়সেই তাঁর কপালে অশ্লীলতার অপবাদ জুটেছিল এবং পবিণত বয়সে ‘রাত ভর বৃষ্টি’ লিখে তিনি আদালতে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্তও হয়েছিলেন, তবু আজকে ভিন্ন পরিস্থিতিতে মুক্ত মন নিয়ে তাঁর বই পড়লে ঐ অভিযোগ হাস্যকর ঠেকে। এখনকার দিনে নবাগত কনিষ্ঠ লেখক বা কবিরাও তাঁর চেয়ে ঢের বেশি খোলামেলা। যাই হোক নরনারীর যে আকর্ষণ শুধুই দেহকামনা তার প্রতি তাঁর মনে কোনো অনুরাগ ছিল না। রাত ভর বৃষ্টি, কালো হাওয়া প্রভৃতি যে সব উপন্যাসে এই প্রবৃত্তির শক্তি দেখা যায় সেখানে তা অন্তঃসারশূন্য বা মতলবী মানুষের চরিত্রলক্ষন হিসাবেই দেখানো হয়েছে। বন্দীর বন্দনার কবি জানেন প্রেম মানুষের মুক্তিদাতা এবং বহুরূপী কখনো তা অস্ফুট চেতনাকে জাগিয়ে দেয় (যেদিন ফুটলো কমল); কখনো বা স্বাভাবিক জীবনযাপনের সোজা পথ ছেড়ে মান অভিমানের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে (বাসরঘর); মনের গহন অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকতে থাকতে হটাৎ একদিন জেগে ওঠে ওলোট পালোট করে দেয় জীবন, কখনো সার্থকতায় (বিশাখা, কমি) কখনো ব্যর্থতায় (লাল মেঘ, ধূসর গোধূলি)। লেখক কোনো সামাজিক প্রশ্ন তোলেন না। সমাজের চোখে প্রেমের হিতকর বা অহিতকর ভূমিকা নিয়ে তিনি আদৌ চিন্তিত নন; বরং সামাজিক অনুমোদনদর্পিত দাম্পত্যের নীচে ব্যক্তিমানুষের শোষণ তাঁর চোখে পড়ে (নির্জন স্বাক্ষর)। অসামাজিক ও লোকচক্ষে নিন্দনীয় প্রেমের ছবিও তিনি এঁকেছেন (সবিতা দেবী) যেখানে অসম বয়সী শিক্ষকপত্নীর জন্য নবযুবক তার ভবিষ্যৎ নষ্ট কবল। তবুও এ কাহিনী আমাদের মনে জুগুপ্সার সঞ্চার করে না। কারন লেখক দেখতে পান এই ভালোবাসার মধ্যে সখ্য বাৎসল্য মধুর রসের অ

ালোছায়া, যা অব্যস্তর নয়, কলুষিত তো নয়ই।
গল্প তো অশরীরী ভাবমাত্র নয়, তার একটা শরীর দরকার হয় এবং সে শরীর তিনি তৈরি করেন তাঁর অভিজ্ঞতাকে নিপুনভাবে ব্যবহার করে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের মধ্যে তাঁর গল্পগুচেছর অনেক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর দুটি আত্মকথা থেকে জানতে পারি কোন গল্পের উপকরন কোথা থেকে নেওয়া হল। যেমন ঢাকায় তাঁর এক আত্মীয়বাড়ি, যেখানে তিনি বিয়ে বা অন্য সামাজিক উপলক্ষ্যে অথবা বিনা উপলক্ষ্যেও মাঝে মাঝে গিয়ে থ াকতেন সেখান থেকে বাঙ্গালী একান্নবর্তী পরিবারের জীবনযাপন তাঁর মনের মধ্যে বসে গিয়েছিল, এবং পরে তিথিডোর উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যৌবনে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার গিয়েছিলেন কলকাতায় প্রিয়ম্বদা দেবীর বা ড়িতে। সেখানে মা মেয়ে প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদার চেহারা চালচলন পরিবেশ ও আলাপে বিলীয়মান অভিজাত্যের যে প্রভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর 'প্রভাত ও সন্ধ্যা' উপন্যাসের অবয়ব তা থেকেই তৈরি হয়েছে সন্দেহ নেই। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি বাস্তব জীবনকে একটুখানি দেখেন, বাকিটা নেন কল্পনা করে, জোড় মেলাবার দাগটা দেন লুপ্ত করে। এজন্য তাঁর গল্প কখনো এলিয়ে পড়ে না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনোযোগ শক্ত হাতে ধরে রাখে।
বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের জায়গা হল প্রবন্ধ নিবন্ধ। এ বিষয়ে তাঁর সমকালীন লেখকেরা কেউই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নন। সারাজীবন ধরেই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন; বেশীর ভাগই সাহিত্য সম্পর্কিত, আর কিছু অ াছে রম্যরচনা বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। সাহিত্যালোচনায় তিনি বিশ্ব পরিব্রাজক - দেশি ও বিদেশি, আধুনিক ও প্রাচীন মধ্যযুগ নয়) সর্বত্র তাঁর যাতায়াত। আধুনিক সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টি দিয়ে তিনি রামায়ন ও সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার করেছেন অ াধার বাংলা ভাষার অচেনা উদীয়মান কবিদের পরিচিত করেছেন পাঠকদের সঙ্গে। সর্বোপরি আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। গতানুগতিক রবীন্দ্রপ্রশস্তি করে তঁ াকে এক "প্রতিষ্ঠিত নিশ্চল পুতুল" বানানোয় তাঁর চি ছিল না। তিনি তাঁকে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে রেখে বিচার করেছেন এবং ভিতর থেকে দেখেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে তিনি এমন অনেক তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন যা নতুন, এবং যার সঙ্গে প্রচলিত জনমত আগাগোড়া মেলে না। ফলে তা নিয়ে তর্কও হয়েছে অনেক, সে তর্ক সব সময় তাঁর পক্ষে অ ানন্দের হয় নি।
বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধনির্মানের সঙ্গে রবীন্দ্ররীতির সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও আলোচ্য বিষয়ের দিকে বাইরে থেকে অগ্রসর হন না; বা যুক্তি তর্ক প্রমাণ দিয়ে সিদ্ধান্তে আসেন না। তিনি আলোচ্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ভিতর থেকে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে তোলেন। যুক্তির সঙ্গে ছড়িয়ে দেন উপমা। এ জন্য প্রবন্ধগুলিতে নিজস্ব সাহিত্যগুণ ফুটে ওঠে। বোদলেযার বা কালিদাস যাঁকে নিয়েই আলোচনা কন না কেন আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও উদঘাটিত হন। পাঠকও তাঁর উপভোগের অংশীদার হয়ে ওঠে। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাতেও গল্পের মত একটা মনোমুগ্ধকর সম্মোহন আছে। সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ নিয়ে প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ তৈরির কৃতিত্বে তিনি অদ্বিতীয়। ইংরাজি ইডিয়মের বঙ্গীকরনও কম নেই। এই সব কৌশলে তিনি বাংলা ভাষার সীমানা বাড়িয়েছেন,
মরণোত্তর প্রকাশ 'মহাভারতের কথা কে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ বললে ভুল হবে না। কোনো পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যায়ের তাঁর অ ালোচ্য বিষয় ছিল তুলনামূলক মহাকাব্য। সেখান থেকে নতুন করে মহাভারতচর্চা তিনি সু করেন। ক্রমে এই মহাগ্রন্থ তঁ ার মনের মধ্যে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সজীব হয়ে ওঠে, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যে বাহিত হয়, এবং অবশেষে মহাভারতের কথা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মহাভারতীয় ঘটনা ও চরিত্রাবলীর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন ত ার সঙ্গে সকলে একমত না হতেই পারেন, কিন্তু তাঁর যুক্তি কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। বাংলা সাহিত্যে এই বইটির যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে বোঝা যায় পরবর্তীকালে মহাকাব্যের ব্যাখ্যাসম্বলিত প্রবন্ধের আধিক্য দেখে। অন্যতম উদাহরণপৌরাণিক চরিত্রাবলী নিয়ে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ির মনোরঞ্জক লেখাগুলি।
মহাভারতের কথায় সমান্তরালে মনে করতে হয় তাঁর পুরাণাশ্রিত কাব্যনাট্যের কথা। জীবনের শেষ দশকে তাঁর প্রতিভা যেন শতশিখায় জ্বলে উঠেছিল। তপস্বী ও তরঙ্গিনী (১৯৬৬), কালসন্ধ্যা (১৯৬৭-৬৮), অনাম্নী অঙ্গনা, প্রথম পার্থ (১৯৬০-৭০), সংক্রান্তি (১৯৭০-৭১) তার প্রমাণ। এই সব নাটকে তাঁর চিরকালের চর্চিত বিষয় প্রেম তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে বা তার চেয়ে প্রধান হয়ে বেজেছে অন্য সুর। মানব ইতিহাসের কিছু চিরন্তন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে।

মহাকালের সেই অমোঘ সঞ্চরণ এখানে মাঝে মাঝে অনুভূত হয়, পাঠকের ভয় হয়। চেতনাবান মানুষ চিরকাল ধরে যে জীবননার্থ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে তার কিছু কিছু উত্তর তিনি মহাভারতীয় চরিত্রশালায় খুঁজে পেয়েছিলেন। মহাকাব্যিক সম্মুন্নতি যুক্ত, সংযত, সংহত গূঢ়ার্থবোধ সংলাপে এই নাটকগুলিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

।। চার।।

"বলো, এই অভিযান কৃতকার্য?
করেছ কি সন্তোষজনকভাবে পিতৃহত্যা?
বার বার নিজেকে নিধন করে জন্মেছো কি নতুন মাতার গর্ভে?
বলো, কোন দূরদেশে পেয়েছিলে আকাঙ্খিত দু কাঠা শুকনো জমি,
যেখানে একটি রোগা প্রতিকূল গাছে।
অনাবৃষ্টি, অবসাদ, সাহায্যের অভাব সত্ত্বেও
তুলেছিল ফলিয়ে অনেক কষ্টে
দু একটি মৌলিক ফল, যার স্বাদ এখন বিখ্যাত?
সে রয় উত্তরহীন, ইদানিং কানে কম শোনে,
অথবা বাদানুবাদে ইচ্ছা নেই আর।
সে যেহেতু প্রত্যাবৃত - যেখানে যাবার শু সেখানেই,
ভাবে শুধু এরই জন্যে এত ধুন্ধুমার।"

বুদ্ধদেব বসু তখন ষাট পেরিয়েছেন। নিজ প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি পাননি শুধু তা নয়, পরিবর্তে পেয়েছেন' সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিদ্ধতা।" তাঁর অন্তরনিবাসী যে অমর শিল্পী তার এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তিনি তো রক্তমাংসের মানুষও বটে। তাঁর মানুষী অভিমান কোথায় যাবে? সেই অভিমানকে রোমান্টিক কল্পনাবলে রূপান্তরিত করে তিনি তৈরি করলেন অমিতকে, যে তাঁর অগণিত অনুরাগীর ভগ্নাংশ দিয়ে তৈরি, তাঁর মানসসন্তান, সমসাময়িকের গ্লানি থেকে মুক্ত করে যে তাঁকে পৌঁছে দিতে চায় ভাবীকালে "যেদিন আপনার দত্ত উপহার আর তার গ্রহীতাদের মধ্যে ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না আপনার সজীব শারীরিক উপস্থিতি, অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর বৈশিষ্ট্যে গড়া অপনার ব্যক্তিত্ব।"

কিন্তু শুধু সেইজন্য নয়; অমিতের হাতে বিনায়কের মরবার আরো একটি নিগূঢ় কারন ছিল, এবং সেটাই আসল। অমিত বলেছিলো "অপদার্থ, অক্ষম, আত্মমগ্ন, সব ভাবুকের মন আপনি অফুরন্তভাবে বিশ্লেষন করেছেন; আয়নার সামনে বসে তৃপ্তিহীন ভাবে নিজেরই প্রতিকৃতি এঁকেছেন। কিন্তু সত্যিকার মানুষকে কখনো দেখতে পান নি।" অমিতের এই অভিযোগের কোনো স্পষ্ট উত্তর বিনায়ক দিতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসুও পারতেন না, কারন তিনি জানেন কথাটা সত্য। যুগ যুগ ধরে শিল্পিরা জেনে এসেছেন কথাটা সত্য। লেখা, ছবি সুর মূর্তি, মাধ্যম যাই হোক না কেন শিল্পিরা নিজেদেরই ভেঙে ভেঙে দেখেন ও দেখান, জগতের সত্যিকারের ক্ষুধা মেটাবার কাজে তাঁরা লাগেন না। শিল্পিমাত্রেই কখনো না কখনো এই অমোঘ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন যে আমি যে কাজে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি তার মূল্য কোথায়? এই প্রশ্ন যুগে যুগে শিল্পিদের এতদূর তাড়িত করেছে যে তাদের কারো কারো জীবনের কেন্দ্রটাই গেছে বদলে। আজ বিবেকতাড়িত হয়ে অমিত সর্বস্ব ছেড়েছে; আর তার বহু আগে, অনেক বড় মাপের শিল্পি টলস্টয়ও তে তাঁর যথাসর্বস্ব ছেড়েছিলেন। আসল কথা প্রত্যেক শিল্পিকেই নিজ জীবনে এই প্রশ্নের একটা সমাধান পেতে হয়। নইলে তাঁরা কাজ করবেন কি করে? রবীন্দ্রনাথকেও এবার ফিরাও মোরে লিখে নিজের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসতে হয়েছিল।

বৃদ্ধ বিনায়ক তত্ত আজ এই দ্বন্দ্বের স্তরগুলি পেরিয়ে এসেছেন। পেরিয়ে এসেছেন বলেই আজ আর কোনো নিন্দাবাদ তাঁর গায়ে লাগে না। অমিত যেন তাঁরই দ্বিতীয় সত্তা। দুজনে একই উপাদানে তৈরি, দুজনেই নিজ নিজ বিশ্বাসের কাছে অনুদ্বারনীয় ভাবে সমর্পিত। দুজনেই পরস্পরের নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করেন। দুজনের মধ্যেই গভীর ভালোবাসার বন্ধন; অথচ কেউ কাউকে একবিন্দু জমি ছাড়তে রাজি নন। এই দুই জগৎ, কর্ম ও কল্পনার জগৎ, কখনো মিলবে না। বিনায়ক দত্ত জানেন সেজন্য কোনো ভয় নেই। যে কাজের জন্য তিনি নিয়তিনির্দিষ্ট ছিলেন তা করেছেন, এবং তাঁর জীবন সার্থক

হয়েছে, তাই অমিত যেখানে উত্তেজিত, অশান্ত, তিনি সেখানে স্থির নিদ্বিগ্ন। অমিতের হাতের মুঠিতে কালো ইস্পাতের নলটি যখন দেখা দেয় তখনো তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। প্রিয়জনের হাত থেকে শেষ উপহারের মত তিনি তাঁর মুত্তিকে গ্রহণ করেন।

বুদ্দদেব বসু (১৯০৮ - ১৯৭৪) জীবনপঞ্জি

১৯০৮ - ৩০শে নভেম্বর কুমিল্লায় জন্ম। শৈশব কেটেছে নোয়াখালিতে। মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহের কাছে ভাষাশিক্ষার হাতেখড়ি।

১৯২৩ - ঢাকায় আগমন। গৌরবময় ছাত্রজীবনের সূচনা।

১৯২৭ - কল্লোল গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় । কল্লোলে রচনাপ্রকাশ। সাহিত্যিক হিসাবে যুগপৎ খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ। কল্লোলের আদর্শে অজিত দত্তের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় প্রগতি পত্রিকা প্রকাশ ১৯২৭-১৯২৯)।

১৯৩১- ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতায় চলে আসা।

১৯৩৪- রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) চাকুরি লাভ ও বিবাহ।

১৯৩৫- ১লা অক্টোবর 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫-১৯৬১) প্রকাশ

১৯৪২- 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার প্রকাশ

১৯৪৪- স্টেটসম্যান পত্রিকায়' স্বাধীন সাংবাদিকতা

১৯৪৫- রিপন কলেজের চাকরি থেকে পদত্যাগ

১৯৫২- হুন্দ্বদন্তুপ্সর শিক্ষাবিষয়ক কাজে যোগ দিয়ে অল্পদিনের জন্য দিল্লিও ও মহীশূর প্রবাস

১৯৫৩- আমেরিকার পেনসিলভানিয়া কলেজে অতিথি অধ্যাপক

১৯৫৬- যাদবপুর ঝিবিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ব বিভাগ স্থাপন ও সেই বিভাগের উন্নতিকল্পে সর্বশত্তি নিয়োগ।

১৯৬১- রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানের কয়েকটি ঝিবিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বত্তা।

১৯৬৩- যাদবপুর ঝিবিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ

১৯৬৩-৬৫- আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিথি অধ্যাপক। সেখানেই নতুন করে মহাভারত চর্চা এবং 'মহাভারতের কথা'র বীজবপন।

১৯৬৭ - তপষী ও তরাঙ্গিনী নাটকের জন্য সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার

১৯৬৮- জার্মানিতে আমন্ত্রণ বত্তৃতা ও ভ্রমণ

১৯৬৯- 'রাত ভোর বৃষ্টি' উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার অভিযোগ, বিচারের বিড়ম্বনা ও মুত্তিলাভ।

১৯৭০- জাতীয় সম্মান পদ্মভূষণ লাভ

১৯৭৪- ১৮ই মার্চ মৃত্যু

বুদ্ধদেব বসু - রচনাপঞ্জি

নিতান্ত বালক বয়স থেকেই বুদ্ধদেব বসু লেখালেখি শু করেছিলেন এবং তা ছাপাও হয়েছিল, সেই সব কাঁচা লেখা বাদ দিলে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপ্রকাশ ১৯৩১ সালে। তখন থেকে আমৃত্যু তিনি অনলসভাবে অবিচ্ছেদে লিখে গেছেন। তাঁর রচনার পরিমান বিপুল ও বিচিত্র। বর্তমান তালিকায় শুধুমাত্র তাঁর অতি বিশিষ্ট রচনাগুলি উল্লেখ করা হল।

কবিতা ঃ- ১৯৩০ - বন্দীর বন্দনা

১৯৩৭ - কঙ্কাবতী

১৯৪৩ - দময়ন্তী

১৯৪৮ - দ্রৌপদীর শাড়ি

১৯৫৫ - শীতের প্রর্থনা, বসন্তের উত্তর

১৯৫৮ - যে আঁধার আলোর অধিক
১৯৬৬ - মরচে পড়া পেরেকের গান
১৯৭১ - স্বাগত বিদায় ও অন্যান্য কবিতা
অনুবাদ কবিতা- ১৯৫৭ - কালিদাসের মেঘদুত
১৯৬১ - শার্ল বোদলেয়ার, তাঁর কবিতা
১৯৬৭ - হোল্ডার্লিনের কবিত
১৯৭১ - রাইনের মারিয়া বিলকের কবিতা
উপন্যাস ঃ- ১৯৪২ - কালো হাওয়া
১৯৪৯ - তিথিডোর
১৯৫১ - নির্জন সাক্ষর
১৯৫৬ - শেষ পাণ্ডুলিপি
১৯৫৮ - শোনপাংশু
ছোটোগল্প ও শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সংকলনগুলি উল্লেখ করা হল, কারন শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সেখানেই থাকা স্বাভাবিক
ছোটগল্প - ১৯৪৫ - গল্পসংকলন
১৯৫৫ - স্বনির্বাচিত গল্প
১৯৬৩ - ভাসো আমার ভেলা
শিশুসাহিত্য - ১৯৫৫ - ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প
১৯৫৬ - বারোমাসের ছড়া
১৯৬১ - কিশোর সাহিত্য সমগ্র
নাটক ও কাব্যনাট্য ১৯৬৬১- তপস্বী ও তরঙ্গিনী
১৯৬৮ - কলকাতার ইলেকট্রা ও সত্যসন্ধ
১৯৬৯ - কালসন্ধ্যা
১৯৭০ - অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ
১৯৭৩ - সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্কাকু সেন্নিন
ভ্রমন কাহিনী- ১৯৩৭ - সমুদ্রতীর
১৯৬২ - জাপানি জার্নাল
১৯৬৬ - দেশান্তর
স্মৃতিকথা- ১৯৪১ - সব পেয়েছির দেশে
১৯৭২ - আমার ছেলেবেলা
১৯৭৬ - আমার যৌবন (মরণোত্তর প্রকাশ)
রম্যরচনা- ১৯৩৫ - হঠাৎ আলোর ঝলকানি
১৯৪৫ - উত্তর তিরিশ
১৯৬৩ - সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (সঙ্গ নিঃসঙ্গতা অংশটুকু)
প্রবন্ধ- ১৯৪৬ - কালের পুতুল
১৯৫৪ - সাহিত্যচর্চা
১৯৬৫ - রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য
১৯৬৬ - করি রবীন্দ্রনাথ
১৯৬৬ - প্রবন্ধসংকলন

১৯৭৪- মহাভারতের কথা (মরণোত্তর প্রকাশ)

আমাদের কবিতা ভবন (অসমাপ্ত)

ইংরেজি রচনা - ১৯৪৮ - An acre of গুব্জন্দ্বন্দ্ধ গুব্জ্জ্রব্দব্দ

১৯৬২ - Tagore : Portrait of a Poet

সম্পাদিত গ্রন্ধ ১৯৪০ - আধুনিক বাংলা কবিতা (আবু সইদ আইয়ুবের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় পরে বহুবার পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে)

১৯৭১ - An anthology of Bengali writing .

বুদ্ধদেব বসু রচনাবলী - গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড থেকে বাংলা লেখাগুলি বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে এর বাইরেও তাঁর চিঠিপত্র, বিক্ষিপ্ত নানা প্রকার লেখা এবং ইংরেজি রচনার একটা বড় অংশ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গলা একাদেমি তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করবার পরিকল্পনা করেছে এবং এ পর্যন্ত দুখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।